[illegible] চতুর্থ শ্রে[illegible] জন্য [illegible]
ডাইরেক্টারের অনুমোদিত।

মোস্‌লেম্ মহিলা চরিত

আলি আক্‌বর খান, বি. এ

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

"সহায় যদ্যপি
নরের না হয় নারী,—মাতা, স্বসা, জায়া
না হয় মিলিতা পুত্র, ভ্রাতা, পতিসনে—
এ পতিত দেশ কভু না হবে উত্থিত।"

এজেন্ট—প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা

মূল্য ।/০ আনা

প্রকাশক
এ. এ খান, বি এ
হিন্দুস্থান পাব্‌লিশিং হাউস্‌,
৬৭, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ,
রুদ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
৭নং গৌরমোহন মুখার্জীর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন।

মোস্‌লেম মহিলা চরিত চতুর্থ শ্রেণীর মুসলমান বালিকাদিগের জন্য লেখা হইয়াছে। আমাদের দেশের মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষার উপযোগী স্বতন্ত্র কোন পাঠ্য পুস্তক আজ পর্য্যন্তও রচিত হয় নাই। এই অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করিবার আশায় আমি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছি

মুসলমান মহিলা চরিত্র মুসলমান বালিকাদিগের চরিত্র গঠনে সহায় হইবে ভাবিয়া, প্রধানতঃ মুসলমান চরিত্র-ই আমি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সফল হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

দৌলতপুর
বাঙ্গর পোঃ, ত্রিপুরা।
জানুয়ারী—১৯২০ ইং।

আলি আক্‌বর খান

সূচীপত্র।

—:০:—

গদ্য।

পদ্য।—

মোস্‌লেম মহিলা চরিত।

নিষ্কাম প্রার্থনা—রাবিয়া।

আরব দেশে বসর নামে একটি নগর আছে। এই নগরে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে দরিদ্রের গৃহে রাবিয়ার জন্ম হয়। রাবিয়ার মত তপস্বিনী মহিলা জগতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ও পবিত্রতা এবং সর্ব্বোপরি নিষ্কাম প্রার্থনা তাঁহাকে বিশ্ব বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে।

অতি শৈশবকালে রাবিয়া মাতা-পিতাহীন হইয় পাড়া প্রতিবাসীর আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। একদা রাত্রিকালে এক দল বেদুইন ডাকাত তাঁহাকে চুরি করিয়া বসরার বাজারে বিক্রয় করিল। রাবিয়া এক ধনীর বাড়ীতে দাসী হইলেন

রাবিয়ার বাল্য-জীবন দুঃখে কাটিয়াছিল জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে তিনি বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও রাবিয়া মুহূর্ত্তের জন্য খোদাকে ভুলিতেন না, বরং তাঁহার মধুর নাম ডাকিয়া তিনি সকল জ্বালা ভুলিতেন নিজে দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়া সহজেই মানুষের কষ্ট বুঝিতে পারিতেন; তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করিতেন।

রাবিয়ার যে স্বাধীনতা টুকু ছিল দাসী হওয়ার পর তাহাও গেল। খোদাকে ডাকিয়া ও মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া তিনি প্রাণে বিপুল শান্তি পাইতেন। সারাদিন প্রভুর কার্য্য করিয়া সময় পাইতেন না বলিয়া রাবিয়া রাত্রিকালে খোদার প্রার্থনা করিতেন

একদা রাবিয়ার প্রভু বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ রাবিয়ার কুটিরের কাছে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার কুটির আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। রাবিয়া বলিতেছেন, "হে খোদা! তুমি আমাকে পরের দাসী করিয়া দিয়াছ, তাই স্বাধীন ভাবে প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাকিবার আমার সময় হয় না, আমাকে ক্ষমা কর হে হৃদয় স্বামিন্! যতদিন তুমি দীন-দুঃখীর কষ্ট দূর না কর, ততদিন তুমি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিও না আমি বেহেশ্‌তের লোভে কিম্বা দোজখের ভয়ে তোমায় ডাকি না যদি বেহেশ্‌তের লোভে তোমায় ডাকিয়া থাকি তাহা হইলে বেহেশ্‌ত আমার জন্য নিষিদ্ধ হউক : যদি দোজখের ভয়ে তোমায় ডাকিয়া থাকি তাহা হইলে দোজখেই আমার স্থান হউক।"

সামান্য এক দাসীর নিষ্কাম প্রার্থনা দেখিয়া রাবিয়ার প্রভুর ঐশ্বর্য্যের চমক ভাঙ্গিয়া গেল পরদিন তিনি রাবিয়াকে মুক্ত করিয়া গত ব্যবহারের জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন

সাধনার প্রভাবে রাবিয়া অতি উচ্চ ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। নানাদেশ হইতে অনেক পুরুষ ও মহিলা তাঁহার

উপদেশ শুনিতে আসিতেন রাবিয়া মক্ক, মদীনা ও জেরু-সালেমে মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পর জেরুসালেমের পাহাড়ের উপর তাঁহার কবর দেওয় হয় রাবিয়ার কবর এখন তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

অতিথি-সেবা—হজরত ফাতেমা।

হজরত ফাতেমা আমাদের পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কন্যা ছিলেন। ৬০৮ খৃষ্টাব্দে, হজরত ফাতেমা আরব দেশের অন্তর্গত পবিত্র মক্কা নগরীতে হজরত খোদেজার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ধর্ম্মাত্মা আলির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

হজরত ফাতেমার চরিত্র বড়ই সুন্দর ও মধুর ছিল। মানুষের দুঃখ দেখিলে তাঁহার কোমল প্রাণ ফাটিয়া যাইত, রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মলিন মুখ দর্শন করিলে তিনি তাহার সেবা শুশ্রূষা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। খোদার প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল।

হজরত ফাতেমা কখনও স্বামীর অসন্তোষজনক কোন কার্য্য করেন নাই; সর্ব্বদাই একান্তভাবে তাঁহার আদেশ পালন করিতেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল।

অনেক মহৎ গুণের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও আতিথেয়তা গুণে ফাতেমা অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। আলি কায়িক পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলিত। এমত অবস্থায়ও গৃহে এক বেলা অন্নের সংস্থান রাখিয়া যাহা কিছু থাকিত তাহা দীন দুঃখী লোককে দান করিতেন। তিনি অনেক সময় স্বামী

সহ উপবাস করিয়া ভিক্ষুক ও অতিথিকে নিজের মুখের গ্রাস খাওয়াইয়া পরিতোষ করিতেন

হজরত ফাতেমা স্বামী সহ বৎসরের অনেক দিনই রোজা করিতেন এক্তারের পর আহারের জন্য মাত্র কয়েক টুকরা রুটির বেশী কিছুই সংস্থান হইত না একদা রোজার সময় রাত্রিকালে যখন তাঁহারা আহার করিতে উদ্যত হইলেন, এক ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিল অতিথিভক্ত আলি ও ফাতেমা আপনাদের সব কয় টুকরা রুটি অতিথিকে দান করিলেন এবং আনন্দচিত্তে মাত্র পানি পান করিয়া রহিলেন পর দিন রোজার পর রাত্রিকালীন ভোজনের নিমিত্ত কয় টুকরা রুটি প্রস্তুত করিলেন আহারের সময় পূর্ব্ব রজনীর মত এক ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিল স্বামী স্ত্রীতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া অতিথিকে আহার করাইলেন পূর্ব্ব রজনীর মত অদ্যকার রজনীও কাটিল

তৃতীয় দিবসও রোজার পর যখন আহার করিতে যাইলেন তখন এক ভিখারী অতিথি আসিয়া ফাতেমাকে কহিল যে, সে সারাদিন কিছুই আহার করিতে পায় নাই, ক্ষুধার জ্বালায় তাহার প্রাণ বাহির হইতেছে। এই কথা শুনিয়া আলি ও ফাতেমা আর আহার করিলেন না, সব কয় টুকরা রুটিই অতিথিকে দান করিলেন। গৃহে একবারের বেশী খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান কোন দিনই থাকিত না, কাজেই ক্রমাগত তিন দিন রোজার পর এই রজনীতেও মাত্র পানি পান করিয়া রহিলেন

এইরূপে জীবনের কত দিন যে নিজে না খাইয়া আলি ও

রাত্রে কত ক্ষুধার্ত অতিথিকে খাওয়াইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আরব দেশের জগদ্বিখ্যাত অতিথিপরায়ণগণের মধ্যেও হজরত ফাতেমার অতিথি সেবা ধন্য হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অতিথি-সেবার গৌরব চিরদিন পৃথিবীতে থাকিবে।

লোক-হিতকর অনুষ্ঠান—জোবায়দা খাতুন।

মধ্যযুগে বগ্‌দাদ সভ্যতায় ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর সর্বপ্রধান নগরী ছিল বগ্‌দাদ্ তাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত এই মহ নগরী আব্বাস বংশীয় মুসলমান খলিফাগণের রাজধানী ছিল এই স্থান হইতে আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ সমস্ত ইসলাম জগত শাসন করিতেন বিবি জোবায়দা এই বগ্‌দাদের খলিফা বিশ্ব বিখ্যাত হারুন-অল-রশিদের মহিষী ছিলেন।

বিবি জোবায়দা মানব হিতকারিণী ছিলেন তাঁহার অগাধ ধন সম্পত্তি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তিনি এই ধন হইতে মুক্ত হস্তে বগ্‌দাদের দরিদ্রদিগকে দান করিতেন নিজে অতি সামান্য ভাবে খোদার উপাসনায় দিনপাত করিতেন

খলিফা হারুন-অল রশিদ বিবি জোবায়দার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন খলিফ যেমন রাজ্যের প্রজাপালক ছিলেন, বিবি জোবায়দাও তেমনই মানবহিতৈষিণী ছিলেন।

বিবি জোবায়দা মক্কাতীর্থযাত্রী ও আরববাসীদের পানির কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য, ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে, পবিত্র মক্কা নগরীতে এক কোটীর উপর মুদ্রা ব্যয় করিয়া 'নহরে জোবায়দা' নামক এক খাল কাটাইয়া ছিলেন আরবের পানিহীন ছায়াহীন মরু-ভূমিতে ইহা পৃথিবীর লোক হিতকর এক বিরাট কীর্ত্তি

আমরা সুজলা সুফলা স্নেহময়ী বঙ্গ জননীর কাছে থাকিয়া মাত্র

সব পাইয়াছি। আমাদের জীবন ধারণের ও সুখ স্বচ্ছন্দতার উপযোগী সকল জিনিসই এক তরে দান করিতেছেন। আমাদের কাছে হয়ত 'নহরে জোবায়দার' এত কিছু মূল্য নাই। কিন্তু পানিহীন ছায়াহীন মরুময় আরবদেশে তপ্ত বালুরাশির মধ্যে পড়িয়া যাহারা পিপাসায় ছটফট করিতে থাকে, শত চেষ্টায়ও বিন্দুমাত্র পানি পায় না, তাহাদের কাছে 'নহরে জোবায়দার' শীতল পানি লহরী খোদার আশির্ব্বাদের মত আসিয়া তাহাদের তৃষিত প্রাণ শীতল করে।

অবস্থা বিশেষে জগতে বিবি জোবায়দার মত হিতকর কার্য্য কেহ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

কার্য্যদক্ষতা—সুলতানা রাজিয়া।

সুলতানা রাজিয়া আমাদের ভারতবর্ষের পাঠান সম্রাট আল্‌তা-মিসের দুহিতা ছিলেন। রাজিয়া একদিকে যেমন অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন, তেমনই আবার সর্ব্বপ্রকার রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন। রাজিয়া তাঁর অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা, দক্ষতার সহিত সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য পরিচালন, তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সাহস ইত্যাদি গুণে ভারত-বর্ষের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

১২৩৬ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট আল্‌তামিসের মৃত্যুর পর রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতানা রাজিয়া ভিন্ন আর কখনও কোন মহিলা দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক আরও দুই শক্তিসম্পন্ন মুসলিম মহিলা ভিন্ন ভিন্ন দেশে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। একজন মিশরের মামলুক সুলতানা সাজার দরার ও আর একজন পারস্যের সুলতানা আবিশ। সাজার দরার ফরাসী সম্রাট সেন্ট লুইসের ইসলামগ্রাসী ক্রুসেডকে পরাজিত করিয়া ইসলাম জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। পারস্যের সুলতানা আবিশ তাঁহার দেশকে মোঙ্গলের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই তিন জন সুলতানা একই সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান সাম্রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রত্যেকেই কার্য্যকালে নিজ

নিজ দক্ষতা ও শক্তির পরিচয় দিয়া ইস্লাম জগতকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন

ঐতিহাসিক ফেরেশ্তা সুলতানা রাজিয়ার কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "রাজিয়ার পিতা সম্রাট আল্তমিস যখন দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন তিনি দুহিতা রাজিয়ার হস্তে দিল্লীর শাসন ভার অর্পণ করিয়া যাইতেন আল্তমিস বলিতেন, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহই রাজ্য শাসনের উপযুক্ত নয়, রাজিয়া পুরুষের বুদ্ধি ও ক্ষমতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং রাজিয়া রাজগুণে কুড়িটি পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর"

সুলতান রাজিয়া রাজ-পোষাক পরিধান করিয়া সকলের সম্মুখে প্রত্যহ দরবারে বসিতেন ও নিজে সকল বিষয়ের বিচার করিতেন অন্যান্য দেশের রাজগণ তাঁহার সভায় দূত পাঠাইতেন তিনি সকলের সঙ্গে আবশ্যক বিষয়ে আলাপ করিতেন এইরূপে অসামান্য দক্ষতা ও ন্যায়পরতা সহকারে তিনি সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করেন

সুলতান রাজিয়ার এত রাজগুণ থাকা সত্বেও দুর্দান্ত তুর্ক আমির-ওম্রাহ্গণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না মহিলা হাজার শক্তি সম্পন্না হইলেও তাহাদের মত আমির-ওম্রাহের উপর স্বাধীনভাবে শাসন চালনা করিবেন—ইহ তাহাদের সহ্য হইত না। তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না যে রাজিয়ার মত মহিলাও তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে পারেন।

এমত অবস্থায় সুলতানা রাজিয়া জনৈক আবিসিনীয় ব্যক্তির

অশেষ গুণ ও রাজভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উচ্চ পদ প্রদান করেন। ইহার ফলে তুর্ক আমির-ওম্রাহ্গণ বিদ্রোহ করিল। তাঁহারা যুদ্ধ বাধাইয়া দিল রাজিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন।

ইতিহাস-সেবা—গুলবদন বেগম।

গুলবদন বেগম আমাদের ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সম্রাট বাবর শাহের কন্যা ছিলেন। যে সকল বিদুষী মহিলা সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাস, বাগ্মীতা ও পাণ্ডিত্যে ইস্লাম-জগত অলঙ্কৃত করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাশালিনী গুলবদন বেগমও এক জন।

বাবর শাহের মত সুশিক্ষিত নরপতি এশিয়াতে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আত্ম জীবনী পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। তিনি শত দুর্ভাগ্য ও ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তুর্ক ও পারস্য ভাষায় কবিতা ও আত্ম জীবনী রচনা করিবার সময় করিয়া লইতেন, তেমনই দুহিতা গুলবদন বেগমকে নিজ আদর্শে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই গুলবদন বেগম শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন, ইতিহাস পড়িবার ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হয়। ইহার ফলে উত্তরকালে 'হুমায়ুন নামা' নামক তাঁহার স্নেহের ভ্রাতা হুমায়ুনের এক উৎকৃষ্ট জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন।

গুলবদন বেগম একদিকে যেমন বিদুষী ছিলেন অপর দিকে তেমনই ভ্রাতৃস্নেহ পরায়ণ, দয়াশীলা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। তিনি ছায়ার মত ভ্রাতা হুমায়ুনের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের অংশ গ্রহণ করিতেন। শৈশবকালে পিতার সঙ্গে যখন শিবিরে থাকিতেন তখন গুলবদন রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহত সৈন্যগণের সেবা করিতেন, তাহাদের ক্ষতস্থান উত্তম

রূপে ধৌত করিয়া তাহাতে ঔষধ মাখাইয়া বাঁধিয়া দিতেন ও আপন হস্তে পথ্য তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন; তাহাতে আহত-পীড়িত সৈন্যগণের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত।

ফলতঃ যে যুগে ইংলণ্ডের জগদ্বিখ্যাত কবি শেক্সপীয়রও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কল্পনা করিতে পারে নাই সেই যুগে আমাদের ভারতবর্ষে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

হুমায়ুন নামা' গ্রন্থখানি সম্রাট হুমায়ুনের জীবন ও রাজত্ব কালের এক খানা সুন্দর ইতিহাস। ভাষা যেমন সরল তেমনই সুন্দর, গুলবদন বেগম যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অথবা নিজে বিশেষরূপে জানিতেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভব তিনি বাবরের জীবনী সম্বন্ধেও কিছু লিখিয়াছেন।

এই 'হুমায়ুন নামা' য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের পত্নী ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া মূল গ্রন্থসহ প্রকাশ করিয়াছেন লণ্ডন নগরের পুস্তকালয়, কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী এবং ঢাকা কলেজ লাইব্রেরীতে উহার এক খানি করিয়া রক্ষিত আছে।

দুঃখের বিষয় আমাদের সম্পত্তির ও রত্নের যত্ন আমরা জানি না। য়ুরোপে যাঁহার প্রচার তাহা আমাদের হইলেও আমাদের দেশে তাহার প্রচার নাই

স্বদেশপ্রেমিকতা ও তেজস্বিতা—
চাঁদ সুলতানা।

আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্গত দাক্ষিণাত্যে আহ্মদ নগর নামে একটি রাজ্য আছে। হুসেন নিজাম শাহ্ এই রাজ্য স্থাপন করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে, নিজাম শাহ্ এক কন্যারত্ন লাভ করেন। এই কন্যাই পরে আহ্মদ নগরের চাঁদ সুলতানা নামে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিখ্যাত।

বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহের সঙ্গে চাঁদ বিবির বিবাহ হয়। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে, বিজাপুর সুলতানের মৃত্যু হয়। আদিল শাহের ভ্রাতৃপুত্র শিশু ইব্রাহিমকে বিজাপুরের সিংহাসনে বসাইয়া তাহার অভিভাবকরূপে চাঁদ বিবি দৃঢ়তার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইব্রাহিম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শাসনভার আপন হস্তে গ্রহণ করেন। বিজাপুর রাজ্যে আবার বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। চাঁদ বিবি এই সমস্ত ব্যাপারের উপর বিরক্ত হইয়া জন্মভূমি আহ্মদ নগরে চলিয়া গেলেন।

চাঁদ বিবির ভ্রাতা আহ্মদ নগরের সুলতান মর্ত্তুজা নিজাম শাহ্ তখন মৃত হইয়াছেন। সিংহাসনের জন্য আহ্মদ নগরে গোলযোগ উপস্থিত হইল। ইহার ফলে চাঁদ বিবি তাহার ভ্রাতৃপুত্র ইব্রাহিমের বালক পুত্র বাহাদুরকে আহ্মদ নগরের সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য সুশাসনের চেষ্টা করিলেন। দেশের বিপক্ষ দল তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। পরে তাহারা মোগল বাদশাহ্ আকবর শাহকে আহ্মদ নগর আক্রমণ করিতে নিমন্ত্রণ করিল

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহ্, শাহজাদা মোরাদকে আহ্মদ নগর জয় করিতে প্রেরণ করেন। চাঁদ বিবির দেশের লোকগণ তখন বালক সুলতানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আহ্মদ নগরের স্বাধীনতা মোগলের পায়ে বিকাইয়া দিতেছিল। চাঁদ বিবি অদ্ভুত কৌশল ও অসীম বীরত্বের সহিত তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের শিয়া সুলতানগণের সহিত একত্র হইয়া যুদ্ধে নামিবার প্রস্তাব হইল কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না। মোগলেরা আহ্মদ নগর জয় করিতে বারবার চেষ্টা করিল। চাঁদ বিবি তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন।

শাহজাদা মোরাদ আহ্মদ নগর অবরোধ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। এক এক সময় মোগল সৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া যখন আহ্মদ নগরের সৈন্যগণ পলায়নপর হইত তখন চাঁদ বিবি যোদ্ধৃবেশে আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন; তাঁহার সাহস দেখিয়া সৈন্যগণ [illegible] করিত।

শেষে মোগলেরা দুর্গ জয়ের এক নূতন উপায় বাহির করিল। মোগল সৈন্যগণ প্রাচীরের এক স্থান খনন করিয়া প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিল এবং সেই পথ দিয়া দলে দলে [illegible] দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। চাঁদ বিবি রণসাজে সজ্জিত হইয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধের পর যখন বারুদগোলা নিঃশেষ হইয়া গেল তখন তিনি আপনার অলঙ্কার গোলারূপে ছুড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও অতুল সাহস

দুর্গের মধ্যস্থিত সৈন্যগণকে এরূপ উত্তেজিত করিয়া তুলিল যে মোগল সৈন্যগণ তাহাদের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। চাঁদ বিবি সেই রাত্রেই প্রাচীর পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চাশ বৎসরের এক বৃদ্ধা মহিলার প্রাণের এত তেজ ও বীরত্ব দেখিয়া মোগল সৈন্যগণ অবাক্ হইয়া রহিল। পুনঃ পুনঃ আক্রমণের পরও নগর দখল করিতে না পারিয়া মোরাদ চাঁদ বিবির সহিত সন্ধি করিল। ইহার অল্পকাল পরেই চাঁদ বিবি এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে আহ্‌মদ নগরের স্বাধীনতাও লুপ্ত হইল।

স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা কি জিনিস তাহা চাঁদ সুলতানা বুঝিয়াছিলেন। দেশের রাজার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হওয়া যে কি গৌরব ও মহত্ত্বের বিষয় তাহা তিনি জানি[illegible]ার দেশ—জন্মভূমির বিপদে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। মায়ের ডাকে—মায়ের রক্ষার্থে—দেশের বালক সুলতানের কল্যাণ কামনায়, মহিলার লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া চাঁদ সুলতানা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশভক্তি, তাঁহার রাজভক্তি, তাঁহার অসামান্যা তেজস্বিতা ও বীরত্ব সমস্ত ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার মত বীরাঙ্গনা ভারতবর্ষে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার স্মৃতি মহাগীতির মত ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া ধ্বনিয়া যাউক।

প্রতিভা ও মনীষা—নূরজহান।

নূরজহান আমাদের ভারতবর্ষের মোগল সম্রাট বাবর শাহের প্রপৌত্র জহাঙ্গীর বাদশাহের মহিষী ছিলেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে, বাদশাহ্ তাঁহাকে বিবাহ করেন।

নূরজহানের মত সুন্দরী মহিলা পৃথিবীতে বড় জন্মায় নাই। খোদা তাঁহার ভাণ্ডারের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া নূরজহানকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য, প্রতিভা ও মনীষার ইতিহাস কীর্ত্তিতা মহিলাদিগের মধ্যে নূরজহানের প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্গীতে, কবিতা রচনায় ও চিত্রাঙ্কনে তিনি অসামান্যা ছিলেন। শৈশবকালে নূরজহান মাতার নিকট উত্তম লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, তিনি প্রথম কোরআন শরীফ পাঠ করেন। পরে পারস্য ভাষায় তিনি অতি উচ্চ শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। বাল্যকালে আকবর বাদশাহের দুহিতৃগণের সঙ্গে নূরজহানও অশ্বারোহণ, শরচালনা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নূরজহান জহাঙ্গীর বাদশাহের মহিষী হইয়া সুখভোগে সময় কাটাইতেন না। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, শুধু রূপে নয় গুণেও নূরজহান অদ্বিতীয়া ছিলেন। নূরজহান রাজ্যে অনেক সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রচলিত করেন, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যের উপর অসীম ক্ষমতা চালনা করেন। জহাঙ্গীর নামে মাত্র বাদশাহ্ ছিলেন—নূরজহানই প্রকৃত বাদশাহ্ ছিলেন।

নূরজহান স্বামীর উপর অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করেন। জহাংগীরের চরিত্রে এককালে পান দোষ ছিল, নূরজহানের চেষ্টায় তাহা অনেক দূর হয়

নূরজহান নানা রকম পোষাক ও গোলাপি আতর সৃষ্টি করেন তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি সর্ব্বলোক প্রিয়, ন্যায়বতী ও দানশীলা ছিলেন তিনি দুঃখীর আশ্রয় ছিলেন, অনেক অনাথ বালিকার ভরণপোষণ করিতেন ও জীবনে প্রায় হাজার অনাথা বালিকার যৌতুকসহ বিবাহ দেন

সূচীশিল্প ও কারুকার্য্যে নূরজহান অশেষ নিপুণতা লাভ করেন তিনি রেশমী রোমালে বিবিধ রঙের মনোহর ফার্সী কবিতা খচিত করিতেন

নূরজহানের স্বভাব অতিশয় মধুর ছিল তাঁহার সকলের সহিত সমান ভাব ছিল সকলের সুখের প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। মোগল সাম্রাজ্যে কেহ দীন দরিদ্র অসুখী বা অশিক্ষিত থাকে ইহা নূরজহান ইচ্ছা করিতেন না ফলতঃ খোদা নূর জহানকে যেমন সদ্‌গুণে বিভূষিত করিয়াছিলেন তাঁহাকে তেমন পদও দিয়াছিলেন

এত গুণ ছিল বলিয়া জাহাংগীর নূরজহানের হস্তে সাম্রাজ্যের শাসন ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন বাদশাহের আদেশে নূরজহানের নাম মুদ্রায় প্রচলিত হয়; খোতবা ব্যতীত আর সকল রাজকার্য্যই নূরজহানের নামে সম্পন্ন হইত

একবার বাদশাহের সেনাপতি মহব্বত খাঁর সহিত জহাংগীরের

বিবাহ হয়। এই সময় জহানগীর ও নূরজহান কাবুল যাইতে-ছিলেন। পরে সেনাপতি বাদশাহকে বন্দি করিয়া ফেলিলেন। নূরজহান হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেনাপতির সহিত ভীষণ যুদ্ধ করেন। যে মহব্বত খাঁর ভারত বিজয়ী বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শাহজাদা খুরমের মত বীরের দক্ষিণাপথ বিজয়ী শক্তি চুরমার হইয়া গিয়াছিল, মেবারের গর্বিত রাজপুত শক্তি যাহার কাছে নত হইয়াছিল, সেই বাহিনীর বিরুদ্ধে নূরজহান মাত্র ছয় শত সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদের তরঙ্গের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়েন। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দি হন, কিন্তু অচিরেই নানা কৌশলে সৈন্যদিগকে হস্তগত করিয়া নূরজহান মহব্বত খাঁকে বন্দি করেন।

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে, জহানগীরের মৃত্যুর পর, নূরজহান আরও ২০ বৎসর কাল বাঁচিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আর রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, বিধবাদের মত সাদা কাপড় পরিতেন ও নিরামিষ আহার করিতেন। তিনি সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শাহদেরায় জহানগীরের কবরের পার্শ্বে খোদার আরাধনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পর স্বামীর পার্শ্বেই তাঁহার কবর হয়।

পতিপ্রেম—মম্‌তাজ্‌ মহল।

মম্‌তাজ্‌ মহল আমাদের ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহ্‌ শাহ্‌ জহানের মহিষী এবং ভারতসম্রাজ্ঞী জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী নূরজহানের ভ্রাতা আশফের কন্যা ছিলেন তাঁহার প্রকৃত নাম আরজুমন্দ্‌ বানু বেগম, কিন্তু ইতিহাসে তিনি মম্‌তাজ্‌ মহল নামে পরিচিত। বাদশাহ্‌ জহান্‌গীর তাঁহার মধ্যে রাজোচিত গুণ দেখিয়, ১৬১২ খৃষ্টাব্দে, শাহজাদা খুরমের সহিত বিবাহ দেন জহান্‌গীরের মৃত্যুর পর শাহজাদা খুরমই শাহ্‌জহান উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মমতাজ্‌ মহল নূরজহানেরই মত অসামান্যা সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন শাহ্‌জহানের সমস্ত হৃদয় খানি আপন গুণে মমতাজ্‌ মহল হরণ করিয়া তাহার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন ক[illegible]হ্‌জহান ও মম্‌তাজ্‌ মহল উভয়কে উভয়ের প্রাণের মধ্য দিয়া পাইয়াছিলেন তাঁহাদের দাম্পত্যপ্রেম অতি বিশুদ্ধ রূপে জগতে ফুটিয়াছিল; তাঁহারা যেন এক বোঁটায় দুইটি ফুল ছিল

শাহ্‌জহান ও মম্‌তাজ্‌ মহল কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না মমতাজ্‌ মহল সমস্ত কার্য্যে শাহ্‌জহানকে সাহায্য করিতেন কি রাজপ্রাসাদে, কি শিবিরে সকল স্থানেই মম্‌তাজ্‌ মহল ছায়ার মত স্বামীর পার্শ্বে থাকিতেন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধকালে ক্লান্ত হইয়া যখন শাহ্‌জহান রণক্ষেত্র হইতে শিবিরে ফিরিতে

তখন মমতাজ মহলের শুশ্রূষা ও সেবা তাঁহাকে সজীব করিয়া তুলিত, মেবার জয়ের পর যখন শাহজহান মেবার পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া বাল সূর্য্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইতেন তখন মমতাজ মহল তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিতেন

মমতাজ মহলের প্রেমময় হৃদয় বড় কোমল ও মধুর ছিল। তিনি মানুষের দুঃখ দেখিতে পারিতেন না; সর্ব্বদাই মানুষের দুঃখ মোচন, দরিদ্রকে অন্নদান ও অসহায় যুবতীদিগের বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেন

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে, বুরহানপুরের তাঁবুতে মমতাজ মহল প্রসব বেদনায় পীড়িত হন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরই প্রেমময় স্বামীর কোলে মস্তক রাখিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন মমতাজ মহল মৃত্যুর সময় স্বামীর কাছে তাঁহার কবরের উপর ভালবাসার চিহ্ন রাখিতে ও তাঁহার সন্তানদিগকে স্নেহযত্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর বাদশাহ্ যাঁহার আকণ্ঠ প্রেমে নিমজ্জিত ছিলেন তাঁহাকে হঠাৎ হারাইয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন বাদশাহ্ শোকে ও দুঃখে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে ক্রমাগত দুই বৎসর যাবৎ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন কোন কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল না এবং কাহার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতেন না মমতাজ মহলের বিরহে তাঁহার কেশ সাদা হইয়া গিয়াছিল

বাদশাহ্ মমতাজ মহলের শেষ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে

প্রতিপালন করিয়াছিলেন তিনি জীবনে কখনও আর বিবাহ করেন নাই যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা নগরে, মমতাজ মহলের কবরের উপর তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেমের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ শাহ্‌জহান তাজ্‌মহল নামক অতি সুরম্য অট্টালিক নির্ম্মাণ করেন ইহ নির্ম্মাণ করিতে চারি কোটীর উপর মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল

এই তাজমহল শাহ্‌জহান বাদশাহের আক্ষেপে আপ্লুত অমর ভালবাসার বিয়োগ কাহিনী তাজমহল দেখিলে মনে হয় ভারতীয় স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের পরিস্ফুট মূর্ত্তি জীবন্ত মমতাজ গোলাপি বসন পরিধান করিয়া যমুনার উপর দাঁড়াইয়া অস্তগামী সূর্য্যের দৃশ্য দেখিতেছেন। এই তাজমহল ভারতবর্ষের বুকের উপর দাঁড়াইয়া মমতাজ্‌মহলের পতিপ্রেমের কাহিনী জগতকে বলিতেছে

~~প্রাচীন~~ গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল অ্যাথেন্স্ নগরে পার্থেনান নামক পলাশ আথেনির মন্দির আছে যুরোপীয় দর্শক ও পরিব্রাজকগণ তাজমহলকে এই মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন বিখ্যাত হেভেল সাহেব বলেন, গ্রীক বীণাপাণি পলাশ আথেনি এক অমূল্য বস্তু; এই অমূল্য বস্তু রক্ষা করিবার জন্য পার্থেনান নামক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু আগ্রার তাজমহলই পলাশ আথেনিরূপ অমূল্য বস্তু

পিতৃভক্তি—জহানআরা বেগম।

জহানআরা বেগম আমাদের ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহ শাহ্‌জহানের প্রথমা দুহিতা ছিলেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার মাতা মমতাজমহল বেগমের অকাল মৃত্যু হয়। মাতার অবর্ত্তমানে পিতা শাহ্‌জহানই মাতৃস্নেহে মমতাজমহল বেগমের সন্তানগণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

বাদশাহ শাহ্‌জহান জহানআরাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ও তাঁহাকে উচিতমত লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজনীতি শিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে জহানআরা বেগম যেমন সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন তেমনই রাজনীতিজ্ঞা হইয়াছিলেন। বাদশাহ শাহ্‌জহান রাজ্যের শাসন কার্য্য এই রাজনীতি বিশারদ কন্যার পরামর্শ লইয়া করিতেন।

আওরঙ্গজেব যখন দক্ষিণাপথ হইতে সৈন্য লইয়া শাহ্‌জহানের প্রতিনিধি শাহজাদা দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন তখন জহানআরা আওরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন "তোমাকে লিখি— এই অভিমানে হিন্দুস্থানে আগুন জ্বালানই যদি তোমার মনের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে শেষে অখ্যাতি ব্যতীত আর কোনও ফল হইবে না। আমরা এই মর দুনিয়াতে অল্প দিনের জন্যই আসিয়াছি। দুনিয়ার আনন্দ আমাদিগকে নানা অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত করিয়া অশেষ দুঃখের সৃষ্টি করে। এই কার্য্য হইতে

বেগম ব বিবেচনাক উচিৎ সাধ্যমত পিতাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা কর, কারণ ইহকালে ও পরকালে আনন্দলাভের ইহাই একমাত্র উপায় পিতাকে খোদার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে।"

শাহজাদী জহানআরার পিতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়। পুত্র ঔরঙ্গজেব যখন বৃদ্ধ পিতাকে আগরার দুর্গে বন্দি করিয়, ডঙ্কা বাজাইয়া, বিজয় নিশান উড়াইয়া পিতার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তখন জহানআরা তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দতা তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় কারাগার গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতার দুঃখে সমদুঃখিনী হইয়া তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া সাত বৎসর পিতার সেবা করেন একে একটি পুত্রের নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ শাহজহানের অস্থি পঞ্জর ভাঙ্গিয়া প্রাণ বাহির হওয়ার মত হইত, এমন দুঃসময়ে ও শোকের মধ্যে জহানআরা জননীর স্নেহে, বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং যত্ন করিতেন জহানআরার প্রীতিপূর্ণ সেবা-শুশ্রূষার ফলেই শাহজহান সাত বৎসর কাল কারাগারে বাঁচিয়াছিলেন

ফলতঃ বন্দিদশায় বেগম জহানআরাই তাঁহার প্রিয় পিতার অন্ধের যষ্টি ও আঁধারের আলো ছিলেন। তিনি পিতৃসেবায় নিরত হইয়া জগতে পিতৃভক্তির আদর্শ হইয়া গিয়াছেন। পিতা বেহেশত, পিতা ধর্ম্ম, পিতার সেবায় খোদা ও পয়গম্বর সন্তুষ্ট হয়েন--জহানআরা এই মহাবাক্য বুঝিয়াছিলেন, তাই অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন মক্কা ও মদীনা

শরীফের মত মহাতীর্থ দর্শন করিয়া যত পুণ্য সঞ্চয় হয়, বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়া জহান্আরা তাহা অপেক্ষা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন

জহান্আরা পিতার মৃত্যুর পরও অনেক দিন জীবিত ছিলেন তিনি খোদার উপাসনা ও ধর্ম্মাচরণ করিয়া অতি সাধারণভাবে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যে ঐশ্বর্য্য ও বিলাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিতার সঙ্গে কারাগারে গিয়াছিলেন তাহা আর কোন দিন জাহান্আরাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই

তিনি চিরকুমারী ছিলেন। পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লী আসিতে পথে একটি বড় কবরস্থান দেখা যায়। তাহার মধ্যে শ্যামল দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত একটি কবর আছে ইহাই জহান্আরার কবর। তাঁহার আপন ইচ্ছানুরূপ "তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণে" কবর আচ্ছাদিত হইয়াছিল

সাহিত্যসেবা—জেব্‌উন্নিসা বেগম।

জেব্‌উন্নিসা আমাদের ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গ্‌জেবের দুহিতা ছিলেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার জন্ম হয়। বাদশাহের দুহিতৃগণের মধ্যে জেবউন্নিসাই সকলের বড় ছিলেন।

জেবউন্নিসার অসাধারণ মেধাশক্তি ছিল। তিনি সাত বৎসর বয়সের সময় আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ পবিত্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন মধুর ছিল যে তাঁহার কোরআন শরীফ পাঠ শুনিয়া সকলেই আত্মহারা হইত।

সে সময়ে ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষাই রাজভাষা ছিল। তজ্জন্য বাদশাহ জেবউন্নিসার ফারসী ও দুরূহ আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করেন। জেবউন্নিসা অল্প কয় বৎসরের মধ্যে ফারসী ও আরবী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা ও জ্ঞান লাভ করেন।

এই সময় হইতে জেবউন্নিসা [illegible] উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত কোরআন, হাদিস, ফেকা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

শৈশবকাল হইতেই জেবউন্নিসা ফারসী কবিতা রচনায় মন দিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার রচিত কবিতা সকল "দিওয়ানে মখ্‌ফি", নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতা

পুস্তক পণ্ডিত সমাজে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছিল তাঁহার কবিত সংসার বিরাগী উদাস ভাবের খোদার প্রতি ভক্তি ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ

জেবউন্নিসা পণ্ডিত ছিলেন তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় ও সাহিত্য সেবায় আপন জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন তিনি পণ্ডিতদের যথেষ্ট যত্ন ও সম্মান করিতেন গুণবান ও উপযুক্ত কবি এবং লেখকে তিনি পুরস্কার প্রদান করিয়া সাহিত্য সেবায় উৎসাহিত করিতেন তাঁহার অর্থ সাহায্যে মোল্লা সফিউদ্দিন কোরআন শরীফের তফছিরের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন

সাহিত্য সেবাই জেবউন্নিসার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জ্ঞান পিপাসু পণ্ডিতগণের সুবিধার জন্য একটি লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। নানা দেশ হইতে উচ্চ বেতনে লেখক আনাইয়া অসংখ্য মূল্যবান পুস্তক নকল ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন জেবউন্নিসা বুঝিয়াছিলেন প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় সুসংগৃহিত পুস্তকাগার তাই তিনি অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া বিরাট পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছিলেন বর্ত্তমানকালে পুস্তক সংগ্রহ করা যত সহজ সেকালে তত কঠিন ছিল, কেনন তখনও মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই তখন সমস্ত পুস্তকই হাতে লিখিয়া লইতে হইত। এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও জেবউন্নিসার পুস্তকাগারের খ্যাতি সমস্ত মুসলমান দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল

জেবউন্নিসা ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্য সেবায়

প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অতি সামান্য সাদা কাপড় পরিতেন।

বাদশাহ্‌ আওরঙ্গজেবের ন্যায় জেব্‌উন্নিসা অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। নমাজ, রোজা ও শাস্ত্রের অন্যান্য আদেশ পালন না করিয়া তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি শত শত হাজীকে মক্কা ও মদীনা তীর্থ দর্শন করিবার খরচ দিতেন। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে জেব্‌উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী লাহোরে তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছিল।

শাহজাদী জেব্‌উন্নিসার মত সাহিত্যসেবা ভারতবর্ষে অতি অল্প লোকেই করিয়াছে।

দানশীলতা—নওয়াব বেগম।

নওয়াব বেগম আমাদের বঙ্গদেশের অন্তর্গত মুরশিদাবাদ নগরে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, জন্ম গ্রহণ করেন তের বৎসর বয়সের সময়, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, সুবে বাঙ্গালার শেষ নওয়াব নাজিম্ সৈয়দ মনসুর আলি খান বাহাদুরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়

নওয়াব বেগম নানা সদগুণে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি দরিদ্রের আশ্রয় ও জননী ছিলেন সর্ব্বোপরি তাঁহার মত দানশীলা মহিলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কাশিম বাজারের মত রাণী স্বর্ণময়ী ব্যতীত আর বাঙ্গাল দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই এই দুই দানশীলা মহিলা বঙ্গ জননীর গৌরব ছিলেন বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক হিতকর কার্য্যের সহিত এই দুই পুণ্যবতী মহিলার দান গ্রথিত রহিয়াছে

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, নওয়াব বেগমের স্বামী পরলোক গমন করেন স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুত্র ও অনেক লোকজন সঙ্গে করিয়া তীর্থ দর্শন করিবার জন্য মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয় প্রথমে কারবালা গমন করেন সেখানে দয়া ধর্ম্মের কার্য্যে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ করেন। মুসলমান বালকগণের শিক্ষার জন্য সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয় উক্ত মাদ্রাসার সাহায্যে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

ইহার তিন বৎসর পর নওয়াব বেগম মক্কা ও মদিনাশরীফ দর্শনে গমন করেন। এই সময়, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূতা হইয়া পড়েন প্রাণ পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার দান অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল এই পর্য্যন্ত তিনি ৩টি লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

নওয়াব বেগমের দানশীলতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না তিনি প্রতি বৎসর সরকার হইতে এক লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন; তাহার অধিকাংশই দেশের হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতেন তাঁহার অসংখ্য দানের মধ্যে লেডি ইলিয়ট হোষ্টেল আলিগড় কলেজের তহবিল, কলিকাতার মেকেঞ্জিওয়ার্ড, মার্কাশ স্কোয়ার ও মেট্রপলিটান ক্লাব প্রভৃতি বহু দেশহিতকর অনুষ্ঠানে যে দান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি লেডি ডাফারিণ তহবিলের পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন স্ত্রী শিক্ষার জন্য, তিনি সম্পূর্ণ আপন ব্যয়ে কলিকাতায় একটি বালিকা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন নানা ধর্ম্মকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি প্রচুর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নওয়াব বেগমকে তাঁহার দানশীলতার জন্য সি, আই, উপাধি প্রদান করেন। দানশীলা নওয়াব বেগম, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, পরলোক গমন করেন।

ভ্রাতৃস্নেহ—মন্নূজান খানম।

মন্নূজান খানম আমাদের বঙ্গপ্রদেশের বিখ্যাত দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসিনের সহোদরা ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হুগলী নগরে তাঁহার জন্ম হয়।

মন্নূজান খানমের পিতা আগা মোতাহের দিল্লীর বাদশাহের একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, ফলে, মোতাহের নদীয়া ও যশোহর জেলায় প্রচুর ভূসম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই সময় মোতাহের হুগলী নগরে বাস করিতেছিলেন।

মোতাহের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি একমাত্র কন্যা মন্নূজান খানমকে দান করিয়া যান। মন্নূজানের মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর হুগলী নিবাসী হাজী ফয়জুল্লাহকে বিবাহ করেন। মোহাম্মদ মহসিন এই বিবাহের ফল।

মহসিন বৈপিত্র ভ্রাতা হইলেও মন্নূজান তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। শৈশবকাল হইতে মহসিন ভগ্নী মন্নূজান খানমের নিকট থাকিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন ও তাঁর পবিত্র আদর্শে নৈতিক চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। মন্নূজান মহসিনকে এত স্নেহ যত্ন করিতেন যে তাঁহাকে আপন হস্তে খাওয়াইয়া পরাইয়া তৃপ্ত হইতেন।

মহসিনও ভগ্নীকে অতিশয় ভক্তি করিতেন ও তাঁহার মঙ্গল সাধন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। শত্রুগণ এক সময়ে মন্নূজানকে বিষ প্রয়োগে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল কিন্তু

মহসিনের চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ হয় এই ঘটনা হইতে মহসিনের মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয় তাহাতে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ভ্রাতা মহসিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর, মন্নুজান খানম মির্জা সলাহ্উদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন, কিন্তু কিছুদিন পর বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সন্তানাদি না থাকায় তিনি ভ্রাতা মহসিনকে দেশে আসিয়া তাঁহার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

মন্নুজান খানমের চির আদরের মহসিন স্নেহময়ী ভগ্নীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন অতঃপর মন্নুজান খানম মহসিনকে তাঁহার সমুদয় বিষয় সম্পত্তি দান করিয়া সার্থক করিলেন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়

এই মহীয়সী মহিলা মন্নুজান খানমের দান ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ভ্রাতৃস্নেহের অমৃতময় ফল হইতে আমাদের মুসলমান সমাজে অনেক সুফল ফলিয়াছে। কেননা মন্নুজান খানম ভ্রাতা মহসিনকে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়াই সময়ে মহসিন তাহা আমাদের শিক্ষার উন্নতি কল্পে দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যেমন ভগ্নী তেমন ভ্রাতা।

গৃহকার্য্য—তারেখা খানম।

তারেখা খানম আমাদের এই বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ত্রিপুরা জেলার এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ঘরে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, জন্ম গ্রহণ করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, ১৮৬৮খৃষ্টাব্দে এই জেলার দৌলৎপুর গ্রাম নিবাসী তোবাব খান সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়।

তারেখা খানম ধনী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে হইলেও মাতার সুশিক্ষায় অল্প বয়সে নানাপ্রকার গৃহকার্য্যে পটু হইয়া উঠেন; বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সদ্গুণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। ফলে, সময়ে তিনি এক জন পাকা গৃহিণী হইয় এক সুন্দর সংসার গড়িয়া তুলেন।

বিবাহের পর তারেখ খানম পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপন গৃহের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন খান সাহেবের সংসারে তখন আর কেহই ছিল না। সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল হইলেও, গৃহ কার্য্য দেখিবার আপন লোক ছিল না বলিয়া, তাঁহার সংসারে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না; কাজেই চারিদিকে নানা প্রকার অভাব, অনটন ও অসুবিধা লাগিয়াছিল। তারেখা খানমের আগমনে সাংসারিক অবস্থা অন্য রকম হইল। এদিকে খান সাহেবও চাকুরী ছাড়িয়া গৃহে আসিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

আপন গৃহে আসিয়া তারেখা খানম বাড়ীর যে সকল স্থান

ছোট ছোট জঙ্গল ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কাটাইয়া দূর করিয়া বাড়ীখানা সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। ভাঙ্গাচুড় ঘরগুলি মেরামত করাইয়া সম্পূর্ণ বাসপোযোগী করিয়া লইলেন। ঘরের মেজে ও ধা'র, উঠান প্রভৃতি লেপিয়া পুছিয়া ও ঝাটাইয়া দেওয়ায় বাড়ীখান ধব্‌ধবে ও স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। তাহার পর যে ঘরের যেখানে যে জিনিসটি যেমন ভাবে রাখিলে শোভা পায় ও হাত দেওয়া মাত্রই পাওয়া যায়, তাহা তেমন ভাবে গুছাইয়া রাখিলেন

ভাগ্যবতী তারেখা খানমের অক্লান্ত পরিশ্রম, মিতব্যয় ও শৃঙ্খলা গুণে কিছু কালের মধ্যে খান সাহেবের আর্থিক অবস্থা ফিরিল ও সংসারে হাসি ফুটিয়া উঠিল ক্রমে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু গাই, বাগানভরা তরি-তরকারী ও পুকুরভরা মাছ হইল সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা তাঁহাদের পরিপূর্ণ সংসার আনন্দময় করিয়া তুলিল।

অনেক সদ্‌গুণের মধ্যে তারেখা খানমের কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম করা সত্ত্বেও যেমন তাঁহার শরীরে ময়লা থাকিত না তেমনই বাড়ী ঘর সাফ সাফাই ও বিছানা পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত প্রত্যহ গৃহ উঠান ইত্যাদি ঝাট দেওয়ার পর সঞ্চিত আবর্জনা ও তরকারীর খোসা, মাছের আঁইস, কাঁটা প্রভৃতি গৃহকার্য্যের জঞ্জাল, বাসগৃহ হইতে দূরে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিতেন উনুনের ছাই উত্তম সার হয় বলিয়া তাহা তরকারীর গাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিতেন ভাতের ফেন

রান্না ঘরের আশে পাশে ফেলিয়া দিতেন না, বরং একটা হাঁড়িতে জমা রাখিয়া সুবিধামত গরুগাইকে খাওয়াইতেন। রান্না ঘরের হাঁড়ি পাতিল বাসন কোসন বা হাত ধোয়া ময়লা পানি একটা ছোট গামলাতে জমা করিয়া আবর্জনার সঙ্গে ফেলিতেন।

ছেলেমেয়েদের মল মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য একটা গর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে মাঝে মাঝে শুক্না ঝুরা মাটি ফেলিয়া দেওয়া হইত। সকল তৈজস পত্র হাঁড়ি-পাতিল ও বাসন চুলার ছাই দ্বারা মাজিয়া পরিষ্কার পানিতে উত্তম রূপে ধুইয়া লইতেন। রান্নার পূর্ব্বেই চাল, ডাল, মাছ, তরকারী ইত্যাদি ধুইয়া সারি সারি রান্নাঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। পান করিবার জন্য পানি ফুটাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন ও কলসী পূর্ণ করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত রাখিতেন। পরিধেয় বস্ত্র, বিছানার চাদর, বালিশের খোল ইত্যাদি সপ্তাহে এক বার কাচাইয়া লইতেন; কাঁথা, বালিশ লেপ, তোষক প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতেন। সপ্তাহে এক বার করিয়া দো-আশ মাটি দ্বারা ঘরগুলি লেপিয়া দিতেন, তাহাতে ঘর বেশ শুক্না ধব্‌ধবে থাকিত।

এই সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্য্য চাকরবাকর দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না, কাজেই তাবেথা খানম আপন হস্তে এই সকল কার্য্য করিতেন। রন্ধন কার্য্যে তিনি বিশেষ পটু ও অভ্যস্ত ছিলেন। রন্ধন কার্য্য অপরে করিলে স্বামী ও পুত্রকন্যাগণের খাওয়া ভাল হয় না, সামান্য সাবধানতার অভাবে খাদ্য দ্রব্যে ময়লা থাকিয়া পেটে অসুখ জন্মায়, অথচ অযথা খরচ হয়, ইত্যাদি কারণে তিনি

প্রত্যহ দুইবেলা আপন হস্তে রাঁধিতেন তাঁহার হাতের সকল প্রকার রান্না এত পরিষ্কার ও উপাদেয় হইত যে তাহা খাইতে সকলেই অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিত অসুস্থতা বশতঃ কোন দিন অপর কেহ রাঁধিলে সেই দিন প্রায় কাহারও ভাল খাওয়া হইত না।

মিতব্যয় তারেখা খানমের আর একটি বিশেষ মহৎ গুণ ছিল যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়ীতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব তাহা কখনও বাজার হইতে কিনিতেন না আপন চেষ্টা ও যত্নে লাউ, কুমড়া, কড়লে, সিম, ঝিঙা, উচ্ছে, ওল, বেগুন প্রভৃতি সহজ সাধ্য যাহা বাড়ীতে হইত তাহাতে তরকারী কিনিতে হইত না, বরং প্রতি সপ্তাহে কিছু তরকারী বিক্রয় দ্বারা বাজার খরচ চালাইতেন ক্ষেতে উৎপন্ন সরিষ, কলাই হইতে তেল ও ডালের কাজ হইত বাড়ীর এক কোণে কয়েকটি বেড়ি ও রউন গাছ ছিল, এই সকল গাছের বীজ সংগ্রহ করিয়া পিষিয়া নিজ হাতে জ্বালাই বার তেল তৈয়ার করিতেন। কেরোসিন তেল কিনিতে হইত না।

বাড়ীর এক পার্শ্বে খান সাহেব ১৫ ২০টি বোম্বাই কাপাসের গাছ রোপণ করিয়াছিলেন এই সকল গাছহইতে প্রতি বৎসর যে তূলা পাওয় যাইত তাহা তারেখা খানম উত্তম রূপে পিঁজিয়া লইতেন। গৃহকার্য্য শেষ করিয়া অবসর সময়ে রাত্রিকালে চরকায় সূতা কাটিতেন : মিহীন সূতা কাটায় অভ্যস্থ ছিলেন বলিয়া কতি-পয় প্রতিবাসিনী তাঁহার নিকট সূতা কাটা শিক্ষা করিতেন তখন সারি সারি চরকার 'ঘেন্নর ঘেন্নর' শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া

উঠিত গ্রামের তাঁতিগণ সেই সূতা লইয়া কাপড় বয়ন করিয়া দিত, এইরূপে মাত্র পাঁচ ছয় টাকা খরচে, খান সাহেবের সমস্ত পরিবারের বৎসরকাল ব্যবহারের উপযোগী কাপড় হইত।

তাবেখা খানম মাঝে মাঝে সেলাইয়ের কাজও করিতেন। প্রয়োজন মত কাপড় কাটিয়া পিরহান, কুর্ত্তা, গায়ের চাদর ও মাথার টুপি সেলাই করিয়া স্বামী ও পুত্রকন্যাগণকে পরাইতেন, বালিশের খোল, বিছানার চাদর ও সুন্দর সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিয়া তাহাদের শয্যা রচনা করিতেন আবশ্যক মত নিজের ব্যবহারের জন্য কুর্ত্তা তৈয়ার করিয়া লইতেন। এই সকল সেলাইয়ের কার্য্য সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে রান্নাঘরের নিকট কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসিয়া অবসর মত করিতেন।

শিশুর পরিচর্য্যা ও লালনপালনে তাবেখা খানম সুশিক্ষিতা ছিলেন পরিমিত ও হাল্কা পুষ্টিকার খাদ্য সন্তানদিগকে বারবার খাইতে দিতেন যাহাতে তাহারা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারে, ও বিশুদ্ধ পানি পান করিতে পায় সেই দিকে তিনি বিশেষ নজর রাখিতেন। যাহাতে ছোট ছোট সন্তানদিগের গায় ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ না হইতে পারে, সেই জন্য তিনি তাঁহাদের শরীর পরিষ্কার কাপড় বা কুর্ত্তা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন, তাহাতে তাহাদের গা বেশ গরম থাকিত।

প্রত্যহ তাহাদের গায়ে রৌদ্রতপ্ত সরিষার তেল উত্তমরূপে মাখাইয়া প্রয়োজন মত ঠাণ্ডা বা অল্প গরম পানিতে গোসল করাইতেন ও পরে উত্তমরূপে গা মুছিয়া কাপড় পরাইতেন। ঘরে

প্রচুর পরিমাণ খাটি দুধ সর্ব্বদাই মজুত থাকিত, প্রয়োজন মত এক পাকের দুধের সঙ্গে কিঞ্চিৎ গুড়া মিছরি মিশাইয়া শিশুকে অল্প গরম অবস্থায় বার বার অল্প অল্প করিয়া খাইতে দিতেন দাঁত উঠার পর শিশুকে কাঁজি, গরম ভাত ও দুধ দিতেন দাঁত উঠার সময় তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন ও তখন শিশুর গায় কিছুতেই রৌদ্র, গরম বাতাস ও ঠাণ্ডা লাগিতে দিতেন না। এত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন বলিয়া তাঁহার সন্তানগণের প্রায়ই পেটে অসুখ আমাশয় ইত্যাদি হইত না। শিশু বা চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ঘাম হইলে ঘোল খাইতে দিতেন ও কাপড় চোপড় দিয়া ঢাকিয়া তাহাদের শরীর শীতল বাতাস হইতে রক্ষা করিতেন।

এত পরিশ্রম করিয়াও তারেখ খানম ক্লান্ত হইতেন না। আউস ও আমন ধান কাটা হইয়া গেলে, তাঁহাকে তখন অতিশয় খাটিতে হইত। আউস ধান মোটা হইলেও খোরাকির জন্য তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া লইতেন। আমন ধান বিক্রয়ের জন্য উত্তমরূপে শুকাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখিতেন।

তারেখা খানমের স্বভাব অতিশয় মধুর ছিল। স্নেহ মমতায় প্রতিবাসী ও চাকরবাকরদিগকে সহজেই তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন স্বামীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও ভালবাসা ছিল সংসারের এত কাজ কর্ম্ম হাতে থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বদা স্বামীর পরিচর্য্যা ও সেবা করিতেন। স্বামীর আহারের পূর্ব্বে জীবনে তিনি কোন দিন আহার করেন নাই

সংসারের এত সকল কাজ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও তাবেখা খানম কখনও খোদার নমাজের কথা ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি রীতিমত দিনে পাঁচ অক্ত নমাজ আদায় করিতেন এবং ফজরের নমাজ শেষ করিয়া প্রত্যহ কোর-আন শরীফ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। রমজানের রোজা ব্যতীত আরও অনেক সময় তিনি রোজা রাখিতেন।

তাবেখা খানমের এত গুণ ছিল বলিয়া খান সাহেব ধনী ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গৃহ শান্তির আধার হইয়াছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে, তাবেখা খানমের দ্বিতীয় পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে, স্বামীর পায়ে মস্তক রাখিয়া পুত্রকন্যাগণের সম্মুখে খোদার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রিয় পুত্রের অনুসরণ করিলেন।

পতিসেবা —রহিমা খাতুন।

রহিম খাতুন এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশের মহাপুরুষ আইয়ুব নবির সহধর্ম্মিণী ছিলেন। আইয়ুব নবি চারিটি বিবাহ করেন, রহিম খাতুন তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা।

আইয়ুব নবি যেমন ধনী, ধার্ম্মিক, সৌভাগ্যশালী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন তেমনই আথিত্য প্রিয় ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার অনেক আত্মীয়স্বজন ও দাস দাসী ছিল। খোদার ইচ্ছায় হঠাৎ আইয়ুব নবি অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। দুর্ভাগ্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গেই আত্মীয়স্বজন ও দাস দাসী ক্রমে ক্রমে নবিকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কিছু কালের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কেহই রহিল না।

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে নবিবর ভীষণ রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। শরীরে এক প্রকার ফোটক বাহির হইয়া কিছু দিনের মধ্যেই পচিয়া অতিশয় পূয বাহির হইতে লাগিল, নবিবরের নড়াচড়া করিবার শক্তি রহিল না। প্রতিবাসিগণ তাহার দুর্গন্ধে আসা যাওয় বন্ধ করিল; এমন কি নবিবরের, প্রথম তিন স্ত্রীও তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। এই সময় বিবি রহিমা স্বামীর সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন।

বিবি রহিমা অকাতরে ফোটা ধৌত করিয়া প্রত্যহ স্বামীর শরীর পরিষ্কার করিতেন, নবিকে অন্য কাপড় পরাইতেন এবং পথ্য প্রস্তুত করিয়া নিজ হস্তে আহার করাইতেন।

ক্রমে নবির ব্যারাম আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল, শরীরের মাংস পচিয়া খসিতে লাগিল এই সময় রহিমা ব্যতীত তাঁহার অন্য স্ত্রীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল রহিমার কিন্তু বিশ্রাম নাই, ঘৃণাও নাই, পতীই সতীর পরম ধন মনে করিয়া দিবারাত্র স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন

কালক্রমে নবির শরীরের গলিত মাংসে এক প্রকার বিষাক্ত পোকা জন্মিল। পোকার দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিলেন প্রতিবাসিগণ তাঁহার উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এক দূরবর্ত্তী প্রান্তরে বৃক্ষের নীচে রাখিয়া আসিল। পতীব্রতা রহিমাও স্বামীর অনুসরণ করিলেন।

এক মহাবিপদের উপর আর এক বিপদ রহিমাকে কাতর করিয়া তুলিল যাহা কিছু অর্থ ছিল এত দিন স্বামীর শুশ্রূষায় ব্যয় করিয়াছেন, এখন রহিমার হাতে পথ্য যোগাড় করিবার জন্য এক কপর্দ্দকও রহিল না উপায়ান্তর না দেখিয়া রহিমা স্বামীর জন্য গৃহস্থ বাড়ীতে দাসীরূপে খাটিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই তাহাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল না; রহিমা বাধ্য হইয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যাহা পাইতেন তাহাতে কোন রকমে স্বামীর পথ্য হইত

এক দিন রহিমা কিছুই পাইলেন না। এক গৃহস্থ বাড়ীতে কিছু ভিক্ষা চাহিলে, গৃহকর্ত্রী রহিমার মস্তকের চুলগুলির পরিবর্ত্তে ভীক্ষা দিতে চাহিল। রহিমা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া এক

মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্ত্তে তাঁহার স্বামীর দাঁড়াইবার এক মাত্র তৃণ [illegible] খুলিয়া কাটিয়া লইতে দিলেন। রহিমা ভিক্ষা হইতে [illegible] আসিয়া পথ্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে খাওয়াইলেন।

রহিমা এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ কাল অসহনীয় অবমান ও কষ্ট সহ্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন; এক দিনের জন্যও নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

খোদা রহিমার উপর মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নবিবর আঠার বৎসর যন্ত্রণার পর সুস্থ হইয়া পুনরায় শরীর লাভ করিলেন। রহিমার আনন্দের সীমা রহিল না।

রহিমা খাতুনের পতিসেবা জগতে অতি দুর্লভ।

ঈমান—হজরত খোদেজা।

হে মাতঃ খোদেজা বিবি, লও উপহার।
শক্তিহীন মোরা তব শোধিবার ধার
তব কৃত উপকার শোধিবার নয়
ঘোষিবে জগৎ তব মহিমার জয়।
এই যে বহিছে আজি শান্তি সুধা ধার
এইযে টুটিয়া গেছে চির অন্ধকার
তোমারি সন্ধান পাই সকলের মূলে।
অনুপমা তুমি মাতঃ বিশ্ব-নারী-কুলে
কি ঘোর দুর্দ্দিনে তুমি হইলে সহায়
তাই ম মুসলিম জাতি উন্নত ধরায়॥
ভক্তি পুষ্প বিনে বল কিবা আছে আর
অর্পণ করিতে মাগো চরণে তোমার।
স্মরিতে হৃদয় কাঁপে সে ঘোর দুর্দ্দিন
অজ্ঞান আঁধারে মগ্ন আরব যে দিন
পাপাচার অত্যাচার, প্রতি ঘরে ঘরে
দেশবাসী উৎপীড়িত ঘোর স্বেচ্ছাচারে॥
ছিলনা সমাজে কোন শৃঙ্খলা বিধান।
ছিল না কাহারো চিত্তে পাপ পুণ্য জ্ঞান

কাফেরের আচরণ পূর্ণ পেতিষ্ঠিত
মনুষ্যত্ব হারাইয়ে দৈত্যে পরিণত
দুনিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা আছে এক জন
এ বিশ্বাস কারো চিত্তে না ছিল তখন
আরবের এ দুর্দ্দিনে খোদার ইচ্ছায়
মহানবি এক জন জন্মিল তথায় ॥
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জগতে বিদিত
মুস্‌লিম জাতি যাঁর কৃপায় গঠিত
দীন ইস্‌লামের আলো করি বিতরণ
করিলেন আরবের দুর্দ্দশা মোচন
কত যে তাঁহার প্রতি হ'ল উৎপীড়ন
কত দিকে কত চেষ্টা বধিতে জীবন
দেশবাসী উত্তেজিত বধিতে যাঁহারে
সকলের আগে তুমি চিনিলে সে বীরে
হৃদয়ের ভালবাসা শত অনুরাগে
পূজিলে তাঁহারে তুমি সকলের আগে
ইস্‌লামে ঈমান দৃঢ় করিয়ে স্থাপন
রাখিলে অমর কীর্ত্তি উজল ভুবন
কি মহাপ্রাণতা তব নাহি যার সীমা।
গাহিছে জগৎবাসী তোমার মহিমা
কালের অতল গর্ভে বরষ মিশায়
আজিও তোমার কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে গায়।

মরিয়া অমর তুমি মা ঈমান ফলে
ভক্তি উপহার দানে পূজিছে সকলে।
যাচে বর, নরনারী আল্লাতালা পায়
তোমা সম ভাগ্য জায়া যেন পায়
তোমা সম শক্তিময়ী ভক্তিময়ী সতী
ধর্ম্মে কর্ম্মে থাকে যেন সদা দৃঢ় মতি
তোমারই মতন তারা থাকি পতি বুকে
প্রকৃত ধর্ম্মের পথে নিয়ে যাক্ ডেকে
হে মাতঃ, বেহেশ্ত হ'তে কর আশীর্ব্বাদ
নারী হতে ঘুচে যাক চির অবসাদ ॥
তোমার সন্তানগণ নব জাগরণে
ধর্ম্ম পথে ধেয়ে যাক প্রীতি ফুল্ল মনে।
এ বিশ্বের প্রতি কেন্দ্রে জ্ঞানের ভাণ্ডার ॥
লুটিয়া আনুক মাগো রতন সম্ভার
নব আশা নব বল হোক্ জাগরিত
দীন ইস্লামের জ্যোতি হোক্ নবীভূত।
ইস্লামের জয়গান দেশ দেশান্তরে।
আবার উঠুক জেগে শতবর্ষ পরে।

ধর্ম্মানুরাগ — ফাতেমা।

(আমাদের পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওা সাল্লাম যখন দীন ইসলাম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন মক্কাবাসিগণ নূতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে অশেষ নির্য্যাতন করিতে থাকে অবশেষে হজরতকে বধ করিবার জন্য ওমর নামক এক কোরাইশ বীরকে নিযুক্ত করে কিন্তু ইতঃমধ্যে তাঁহার ভগিনী ফাতেমা স্বামীসহ দীন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া, ওমর ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইল ও ফাতেমাকে ধর্ম্মের জন্য দারুণ প্রহার করিতে লাগিল; এমন কি নূতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে বধ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল ফাতেমা কিছুতেই দীন ইসলাম পরিত্যাগ করিলেন না, বরং ধর্ম্মের প্রতি সরল প্রাণের অনুরাগ ও ভক্তি দেখাইয়া ওমরকে দীন ইসলামের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন; তাহাতে ওমরের কঠিন প্রাণ গলিয়া গেল ওমর ধর্ম্মজীবন লাভ করিল এই ওমরই ইতিহাসে দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা ওমর ফারুক নামে বিখ্যাত)

ইচ্ছা যদি হয় তব কাট মম শির
বীরশ্রেষ্ঠ ভাই তুমি,
তোমার ভগিনী আমি
মরণে কাতর নহি, জেন মনে স্থির

পারি না ইসলাম ধর্ম্ম করিতে বর্জ্জন,
সংসারের সুখ আশা,
অসার ভোগের বাসা,
ধরমের তরে পারি দিতে বিসর্জ্জন।

হেন দুরাশ করো না পোষণ,
মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে
সত্য ধর্ম্ম হারাইয়ে
প্রতিমা পুতুল পূজা করিব গ্রহণ?

বুঝিয়াছি সার সত্য দীন ইস্লাম
কোর-আনের পুণ্য বাণী
ধন্য হইয়াছি শুনি
মৃত্যুভয়ে ভুলিব না পবিত্র কালাম

ইসলামে বিশ্বাসী জন, তুচ্ছ ভাবে প্রাণ
দু'দিন এসেছি ভবে
পুনঃ চলে যেতে হবে
জন্মিলে মরিতে হয় এইত বিধান

মরি যদি, হবে মোর সার্থক জীবন,
ধরার মঙ্গল হবে
পাপাচার দূরে যাবে,
ইস্লামের জয়গানে পূরিবে ভুবন।

বীরোচিত নয় তাই এই হীন কাজ,
বধিতে অবলা প্রাণ,
লয়ে তব খরশান,
আগুয়ান রোষভরে, ছি, ছি একি লাজ!

নির্দ্দোষ দুর্ব্বল জনে করিতে পীড়ন,
কাপুরুষ বটে যেই,
উনমত্ত হয় সেই,
বীর তুমি, কেন তব হেন আচরণ?

জানি, তব বাল্য হ'তে বুদ্ধি বিচক্ষণ ;
মহান্ ইসলাম ধর্ম্ম,
না শুনে না বুঝে মর্ম্ম,
পাপের পঙ্কিল হ্রদে হইলে মগন

কোর আনের সত্য বাণী শুন এক বীর,
উপাস্য নাহিক আর,
আল্লা বিনে জেন সার,
হজরত মোহাম্মদ রসুল তাঁহার

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা করিতে প্রচার,
পবিত্র আল্লার নামে
প্রেরিত এ ধরাধামে,
রসুল নাশিতে পাপ তাপ অন্ধকার।

সত্যের শরণ লও, পাল সত্য ধর্ম্ম
হবে তায় চিত্তশুদ্ধি,
দূরে যা'বে পাপ বুদ্ধি,
হিংসা দ্বেষ নহে ভাই বীরোচিত কর্ম্ম

রাখ দূরে তলোয়ার, ছাড় অভিমান
পতিত উদ্ধার কাজে,
ঐরূপ বীর সাজে
বীর যদি বট ভাই, হও আগুয়ান

পাপ কূপ হ'তে কর পতিত উদ্ধার
ঈমান হারায়ে আর,
করিও না পাপাচার,
দীন ইস্লাম বিশ্বে করহ প্রচার

শুনিয়া ওমর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল,
অবশ হইল হস্ত,
দেহ মন হ'ল ত্রস্ত,
ইস্লামের জয়ধ্বনি অন্তরে বাজিল।

ধরিয়া ভগ্নির কর ওমর কহিল,
"ক্ষম মম অপরাধ,
কর মোরে আশীর্ব্বাদ,
তোমার কৃপায় অন্ধ নয়ন ফুটিল

জ্ঞানালোকে আজি মোর শুদ্ধ হ'ল চিত,
বুঝিলাম সার মর্ম্ম,
ইসলাম সত্য ধর্ম্ম
দীন ইসলামের আজি হ'নু শরণাগত।"

বীর্য্যবতী—সকিনা।

(সকিনা আমাদের হজরত ফাতেমার পুত্র ইমাম হুসেনের কন্যা ও তদীয় ভ্রাতৃপুত্র কাসেমের পত্নী ছিলেন। কারবালার ভীষণ মরুভূমিতে মহাত্মা ইমাম হুসেন আত্মীয় পরিজন সহ পিপাসায় কাতর হইয়া শত্রুবেষ্টিত ফোরাত নদীর পানি উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধের পর তাবু বীরশূন্য হইল, তবু ফোরাত নদীর উদ্ধার হইল না। এই সময় কাসেম ফোরাত নদী শত্রুশূন্য করিয়া তাঁবুস্থিত মৃতপ্রায় আত্মীয় স্বজনের পিপাসা মিটাইবার মানসে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও নব পরিণীতা পত্নী সকিনার নিকট বিদায় চাহিলেন। সকিনা স্বামীকে যাহা বলিয়া বিদায় দিয়াছিলেন তাহা কবিতায় বর্ণিত হইল।)

তোমারে বিদায় দিতে কোন সময়ে,
বিচ্ছেদ সন্তাপে শত পরাণ বিদরে
সহজ শঙ্কিত বটে নারীর পরাণ;
অদৃষ্টে অশুভ ভেবে হয় হতজ্ঞান
কিন্তু নাথ বীর তুমি, বীরধর্ম্মাচারী
কেমনে দিবরে বাধা হয়ে তব নারী।
কর্ত্তব্য পালনে তুমি নিয়ত তৎপর
আর্ত্তের বিপদে প্রাণ কাঁদে নিরন্তর –
শত শত ভ্রাতা ভগ্নী পানীয় অভাবে
অকালে মরিছে দেখে কেমনে সহিবে

যাও নারি বীর ধর্ম্ম করহে পালন,
অবিলম্বে ভগিনীর বাঁচাও জীবন
শুধু যে সম্বল আছে ফোরাতের পানি,
করিয়াছে রোধ তাহা এজিদ বাহিনী
যাও নারি, কর ত্বর ফোরাত উদ্ধার,
নতুবা অসংখ্য প্রাণী হইবে সংহার
নাজানি শিবিরে হায় তৃষ্ণার জ্বালায়
এতক্ষণ কত জান ধূলায় লুটায়।
পরের কল্যাণে নিজ স্বার্থ করি পণ
আর্ত্তের উদ্ধার তরে করহে গমন
এসো এ রণবেশে সাজাই তোমায়
খোদাতা'লা হইবেন তোমার সহায়

সমাপ্ত